দুর্ঘটনা ও শোকের বছর

২০০৪ সালে ইরাক বা আফগানিস্তান যুদ্ধের মতো কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি। তবে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববাসীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নিয়েছেন ফিলিস্তিনি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা ৭৫ বছর বয়সী ইয়াসির আরাফাত। প্রত্যাশাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে আরো চার বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বুশ। ভারতে অবশেষে অসাম্প্রদায়িক মানুষের বিজয় হয়েছে। আফগানিস্তানের জনগণ প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছেন ২০০৪ সালেই। রাশিয়ার বেসলানে হাজার দেড়েক শিশুর বেদনাদায়ক ঘটনার সাক্ষীও এ বছর। সুদানে মুসলমানদের হাতেই ৭০ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছেন। ইউক্রেন নিয়ে আমেরিকা-রাশিয়ার রশি টানটানি নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধ ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়। অপরদিকে বছরজুড়েই আলোচনায় ছিল ইরাক। মার্কিন বাহিনীর কোণঠাসা হয়ে পড়ার বছর। ভালো ঘটনার মধ্যে রয়েছে ওয়াঙ্গারি মথাইয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ প্রথম কোনো আফ্রিকান নারী হিসেবে। ভালো ঘটনা কম। সব মিলে ২০০৪ সাল তাই দুর্ঘটনা ও শোকের বছর... লিখেছেন **জামান আরশাদ**

ভারতে অসাম্প্রদায়িকতার বিজয়

সাংবিধানিকভাবে ভারত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক ভারতের ওপর চড়ে বসেছিল সাম্প্রদায়িক ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সংখ্যালঘু বিরোধিতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ উসকে দেয়াই ছিল তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। যদিও ক্ষমতায় গিয়ে 'উদারপন্থি' অটল বিহারি বাজপেয়ির নেতৃত্বে বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজও তারা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তারপরও এ বছরের সাধারণ নির্বাচনে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে। সে ক্ষেত্রে ভারতে এবারের নির্বাচন ছিল মূলত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার বিজয়। আর যার নেতৃত্বে

eQiwU tmwbqvi Dìv‡bi

এই বিপুল বিজয় আসে, তিনি ভারতের প্রাচীনতম দল কংগ্রেস সভানেত্রী 'বিদেশিনী বধূ' সোনিয়া গান্ধী। নির্বাচনে যতটা কংগ্রেসের বিজয়, তার চেয়ে এটা সোনিয়ার ভারত বিজয়।

সাধারণ বিচারে বিজয়ী দলের ক্ষমতার হাল ধরার কথা। যখনই সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, যে দিন তার শপথ নেয়ার কথা, তার আগের দিন 'হা রে রে' করে ওঠে ওই সাম্প্রদায়িক শক্তিটি। সোনিয়া সরে দাঁড়ান ক্ষমতার মসনদ থেকে। ইচ্ছে করলেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। বিজেপির বিরোধিতা কোনো কাজেই আসতো না। বিরোধিতার কোনো ভিত্তিও ছিল না। তারপরও সোনিয়া ক্ষমতার মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে

রাখতে সক্ষম হন। গঠন করেন তার ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স সরকার। প্রধানমন্ত্রী হন ড. মনমোহন সিং। ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে বিরল, যা করে দেখান বিদেশিনী বধূ সোনিয়া গান্ধী।

ইরাকে দ্বিতীয় যুদ্ধ

বছরজুড়ে ইরাক পরিস্থিতি ছিল আলোচনায়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ রাতে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার ভয়ঙ্কর রেশ ২০০৪ সালেও বজায় ছিল। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ২০০৩ সালেই। কিন্তু উপর্যুপরি গেরিলা আক্রমণের মুখে ফাল্লুজা, রামাদি, মসুল, বাকুবা ও সামারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর বেসামরিক নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিঠটান দিতে বাধ্য হয়েছিল মার্কিন সেনারা। মার্কিন সেনারা এই সদর শহর থেকে চলে যাওয়ার পর তা এক প্রকার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় গেরিলারা। আর নিজেদের অবস্থান সংহত করে শানাতে থাকে আক্রমণ মার্কিন সেনাদের প্রতি। একের পর এক আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে ওঠে তারা। অবশেষে মার্কিন সৈন্যরা বিপুলসংখ্যক ইরাকি সৈন্যের সহায়তায় প্রথমে ফাল্লুজা অভিযানে নামে। বেসামরিক মানুষকে গুলি করে, বোমা মেরে হত্যা করে, স্কুল, বাড়িঘর, হাসপাতালে বোমা বর্ষণ করে। আগুনের লেলিহান শিখায় তারা পুনরায় ফাল্লুজা দখল করতে সক্ষম হয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকাগুলোতে এটাকে 'ইরাকে দ্বিতীয় যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একইভাবে মসুল, রামাদি, বাকুবা দখল করতে গিয়েও এক ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। তারপরও বাস্তব তথ্য হলো, এসব শহর থেকে গেরিলাদের বিতাড়িত করা যায়নি। রাজধানী বাগদাদের একটি অংশ এখনো গেরিলাদের কব্জায়।

অন্যদিকে ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেন এখন ইরাকি অন্তর্বর্তী সরকারের জিম্মায়। তার গ্রেপ্তারের এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। মার্কিনিদের ধারণা ছিল, সাদ্দাম গ্রেপ্তার হওয়ায়

Avm‡Q Rvbqvwi Biv‡K wbevPb

e‡ki AbvKvswÿZ weRq

গেরিলা যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়বে। কিন্তু তা তো হয়নি আরো বেড়েছে। মার্কিনিরা আরো একটি ভুল করতে যাচ্ছে এই জানুয়ারিতে নির্বাচনের আয়োজন করে এবং সুন্নিদের নির্বাচন থেকে বাদ রাখার অপচেষ্টা করে।

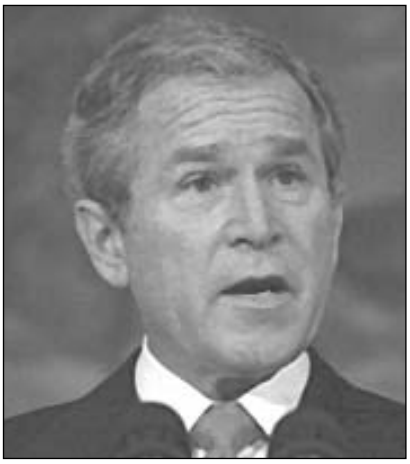

হামাসের সৌন্দর্যকে হত্যা

হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ইয়াসিন ছিলেন ফিলিস্তিনের সৌন্দর্য। ৬৭ বছর বয়সী এই নেতা কোনো ধরনের সহিংসতায় জড়িত ছিলেন না। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই নেতার সময় কাটতো হুইল চেয়ারে। তিনি হাঁটাচলা করতেও সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু আচমকা ইসরায়েলি হামলায় ২০০৪ সালের ১৭ মার্চ তাকে হত্যা করা হয়। এর আগেও শ্যারন তাকে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ইয়াসিনের মৃত্যুর পর হামাসের নেতৃত্বে আসেন আব্দুল আজিজ আল রান তিসি। তাকেও হত্যা করা হয় ১৭ এপ্রিল। সারা বিশ্ব থেকেই এ ধরনের হত্যাকান্ডের জন্য ইসরায়েলের প্রতি চরম নিন্দা করা হয়। তারপরও চুপচাপ ছিলেন বুশ।

বুশের বিজয়, পরাজয় মানবতার

ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আফ্রিকার ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষ চেয়েছিল ২০০৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে একটা পরিবর্তন আসুক। সোজা কথায়, বুশের পরাজয়ই তারা কামনা করেছিল। কিন্তু এই চাওয়া, এই কামনার সঙ্গে মার্কিন জনগণের চাওয়া ও ইচ্ছার পার্থক্য ছিল। যার ফলাফল বেরিয়ে এসেছে নির্বাচনে। হ্যাঁ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন জর্জ ডব্লিউ বুশ, যিনি তার বিগত চার বছরে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে আফগানিস্তান ও ইরাক এক প্রকার দখল করেছেন। সেই যুদ্ধবাজ নেতাকেই রায় দিয়েছে মার্কিন জনগণ। তার মানে এই নয়, মার্কিন জনগণ সবাই যুদ্ধ চায়। আসলে এবারের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর জনগণের নিরাপত্তার বিষয় এতো ব্যাপকভাবে সামনে চলে আসে যে, জনগণ এর বাইরে চিন্তা করতে পারেনি। আর এই নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষেত্রে তারা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কেরির চেয়ে বুশকেই বেশি যোগ্য মনে করেছে। নির্বাচনের আগে একাধিক জনমত জরিপেও বিষয়টি ফুটে উঠেছিল।

তাছাড়া সমকামী বিয়ে, গর্ভপাত ও স্টেন সেল গবেষণার মতো বিষয়ে ভোটাররা বুশের বক্তব্যই গ্রহণ করেন। বুশ এই তিনিটি বিষয়েরও কট্টর বিরোধী। অপরদিকে কেরি উদার। বুশ বোঝাতে সক্ষম হন এগুলো সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনবে। শহরতলীর ভোটাররা বিশেষ করে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিষ্টানরা বুশের কথাগুলোই মেনে নেন। ভোট দেন 'গর্দভ' হাতি প্রতীকে। অন্যদিকে একমাত্র ইরাক যুদ্ধ ইস্যুতে এগিয়ে ছিলেন কেরি। এ ক্ষেত্রে তরুণ ও কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল তার সমর্থক। কিন্তু ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী ভোটারদের মাত্র ১০ শতাংশ ভোট দিতে যান। এখানে পিছিয়ে পড়েন কেরি। তবে এবার যারা বুশের পরাজয় চেয়েছিলেন, তাদের জন্য শুভ

Avnt‡g` Bqvwmb Ges ivbwZwm : `Rb‡K nZ¨v K‡i‡Q Bmiv‡qj

সংবাদ, আগামী নির্বাচনে বুশ দাঁড়াতে পারবেন না। মার্কিন সংবিধানে এ রকম লেখা আছে।

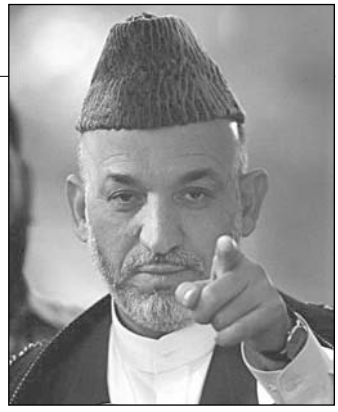

সুদানে ৭০ হাজার মুসলিম হত্যা

আফ্রিকার হতদরিদ্র দেশ সুদানের দারফুর প্রদেশে সরকার সমর্থিত গেরিলাদের হাত কালো মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয় এ বছরই। দারফুরের জনসংখ্যার দুটি ভাগ। এক ভাগে আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী, অপরদিকে আরব জনগোষ্ঠী। কিন্তু আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গরা সবদিক থেকেই ছিল বঞ্চিত। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। গঠন করে সুদান লিবারেশন আর্মি (এসএলএ) ও জাস্টিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি মুভমেন্ট (জেম)। তাদের বিদ্রোহ দমনে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বশির কিছুটা ভিন্ন কৌশল নেন। বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার না করে তিনি আরব বংশোদ্ভূত মুসলমানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেন। তারা 'জানজাবিদ মিলিশিয়া' নামে পরিচিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণাঙ্গ সুদানিদের ওপর। এখানে বলে রাখা দরকার, যারা মার খাচ্ছে আর যারা মার দিচ্ছে তারা উভয়েই মুসলমান। পার্থক্য এক পক্ষ সুবিধাপ্রাপ্ত, অপর

`vidi msK‡Ui w`‡K wekevmxi `wó wQj mviveQi

পক্ষ সুবিধাবঞ্চিত।

সুদান সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে জানজাবিদ মিলিশিয়াদের রক্তের হোলি খেলায় প্রাণ হারায় ৭০ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম। অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয় ১৬ লাখ মানুষ। প্রতিবেশী দরিদ্র রাষ্ট্র শাদে আশ্রয় নেয় ২ লাখ মানুষ। আর বাকিরা আশ্রয় নেয় সুদানের সীমান্তে।

এ রকম মানবিক বিপর্যয় আগে মাত্র একবার হয়েছিল। সেটা হলো রুয়ান্ডায় হুতু-তুতসিদের মধ্যে সংঘাতের ফলে। এতো কিছুর পরেও সুদান সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও জানজাবিদ মিলিশিয়াদের নিরস্ত্র করেনি। এমনকি জাতিসংঘের ত্রাণকর্মীদেরও তারা বাধা দিচ্ছে। আর দারফুরে ৭০ হাজার মুসলিম হত্যার পরেও মুসলিম দেশগুলো, এমনকি ওআইসি একদম চুপচাপ। সত্যিই সেলুকাস,

†emjvb U¨v‡RwW : eQ‡ii Ab¨Zg ggwš—K NUbv

কি বিচিত্র এই ওআইসি।

আফগানিস্তানে ঐতিহাসিক নির্বাচন

শুরুতে একটি তত্ত্ব জানিয়ে দেয়া দরকার। আফগানিস্তানের জনগণ ২০০৪ সালের আগে কোনো দিন ভোট দেয়নি। একটি জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেয়ার সুযোগ তাদের জীবনে কখনো আসেনি। এর কারণ আঞ্চলিকতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সেখানে সব সময় গোষ্ঠী শাসন চলেছে। আফগান জাতীয়তাবোধে কখনো জনগণ উজ্জীবিত হয়নি। তারা বরং পাশতুন, তাজিদ, হাজারা এসব গোত্রে বিভক্ত। গোত্রই তাদের পরিচয়, গোত্র ছাপিয়ে দেশের পরিচয়ে পরিচিত হতে পারেননি তারা। এ রকম একটি গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ২০০৪ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে।

নির্বাচনের ফলাফল আগেই জানা ছিল। বছর তিনেক আগে মার্কিন অভিযানের মুখে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের তালেবান শাসনের পতন হলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন মার্কিন অনুগ্রহপুষ্ট পাশতুন নেতা হামিদ কারজাই। নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে সময় লাগে তিন বছর। তিনি নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট, বিপুল ভোটে, বিপুল ব্যবধানে। নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক জাল ভোট, কারচুপির অভিযোগ এনে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনুস কালুনি, তাজিক নেতা আব্দুর রশীদ দোস্তাম। ফলাফলে দেখা যায়, ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তারা সবাই ভোট দিয়েছেন! তারপরও পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, জাল ভোট পড়েনি।

নতুন প্রেসিডেন্ট কারজাইকে নিয়ে বেশ আশাবাদী পশ্চিমা বিশ্ব। জনগণ ততটা আশাবাদী নন। কারণ আশা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন এসব তারা ভুলে গেছে। এখন তাদের স্বপ্ন দেখা মানেই স্বপ্নভঙ্গ।

KviRvB : †c‡q‡Qb `vjwji ci¯‹vi

বেসলান ট্র্যাজেডি : ভুল পথে চেচনিয়া

রাশিয়ার উত্তর ওশেটিয়া অঞ্চলের বেসলান শহরে একটি স্কুলে চেচেন বন্দুকধারীরা প্রায় হাজার দেড়েক ছাত্রছাত্রীকে জিম্মি করেছিল। মুসলিম অধ্যুষিত চেচনিয়া থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার এবং রাশিযার কারাগারে আটক চেচেন যোদ্ধাদের মুক্তি ছিল তাদের প্রধান দুটি দাবি। কিন্তু আলোচনার পথে না গিয়ে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রুশ সরকার। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিনের নির্দেশ পেয়ে সৈন্যরাও বাইরে থেকে স্কুলটি অবরোধ করে রাখে। অন্যদিকে ক্ষুধা, যন্ত্রণায় কাতর শিশুরা তখন মরণাপন্ন। প্রতিদিনই শিশু মরতে থাকে। দু-একজন বেরিয়ে আসে। এরই মধ্যে একদিন সরকারি সিদ্ধান্তে সৈন্যরা স্কুলে ঢুকে চেচেনদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কিন্তু তাতে মারা পড়ে কোমলমতি শিশুরা। আর চেচেন জঙ্গিরা তখন সাধারণ বেশ ধরে পালাতে ব্যস্ত। চেচেন বন্দুকধারীরাও সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দু'পক্ষের মধ্যে বন্ধুকযুদ্ধকালে শিশুরা মারা যায় কাতারে কাতারে। প্রায় এক হাজার শিশুর মৃত্যু হয়।

চেচেন নেতা শামিল বাশায়েভের পরামর্শে জঙ্গিরা শিশুদের জিম্মি করেছিল। চেচেনরা যদি এটা ধরে নেয়, শিশুদের জিম্মি বিমান ছিনতাইয়ের মধ্যেই রয়েছে তাদের স্বাধীনতা, তাহলে বলতে হচ্ছে, ২০০৪ সালেও তারা ভুল পথে রয়ে গেছে। আর পুতিনকে বলতে হচ্ছে, রাষ্ট্র চালানো আর কেজিবি চালানো এক নয়। সব সময় অস্ত্র নয়, আলোচনার ভাষায় কথা বলতে শিখুন।

আফ্রিকার নারীর বিশ্ব জয়

এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারটা যার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির (আইএইএ) প্রধান মোহাম্মদ এলবারাদি । এ ছাড়া জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান হ্যান্স ব্লিক্সও আলোচনায় ছিলেন। মূলত এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার মনোনয়নের তালিকায় ছিলেন ১৯৪ জন। সবাইকে হারিয়ে পদক জিতে নেন আফ্রিকার পরিবেশবাদী নেত্রী ৬৪ বছর বয়সী ওয়াঙ্গারি মাথাই। তার এ

পুরস্কারপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে প্রথম কোনো আফ্রিকান নারী এবং প্রথম কোনো পরিবেশবাদীর ভাগ্যে এ পুরস্কার জুটলো। প্রফেসর ওয়াঙ্গারি মাথাই কেনিয়ার উপ-পরিবেশমন্ত্রী। এটা তার নামের আগে যতটা সম্মান এনে দিয়েছে, তারচেয়ে জরুরি তথ্য হলো, তিনি আফ্রিকার গ্রিন বেল্ট মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রকল্পের অধীনে তিনি ২ থেকে ৩ কোটি গাছ লাগিয়েছেন, আফ্রিকাকে মরুকরণ থেকে রক্ষা করতে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তাই তার কাজেরই স্বীকৃতি।

Avivdv‡Zi we`vq : †Kvb mgvKi‡YB †h gZ¨‡K †gjv‡bv hvq bv

আরাফাতের মৃত্যু : অধরা স্বাধীনতা

রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ধরনের হন। কিছু রাজনীতিবিদ আছেন, জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আবার কিছু রাজনীতিবিদ আছেন, তারা সারা জীবন জনগণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে যান। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায় থেকে পিছিয়ে যান না। এই রাজনীতিবিদদের মধ্যে কেউ সফল হন, আবার কেউ কেউ সফল হওয়ার জন্য নিজের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে যান। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম রাজনীতিবিদের নাম করলে ড. সুকর্নো, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, ইয়াসির আরাফাতের নাম আসে।

me‡Ri ivYx gv_vB : e¶ †ivcY ïW‡c-v‡gmx

এঁদের মধ্যে ইয়াসির আরাফাত এমন একজন রাজনীতিবিদ, যিনি ফিলিস্তিনি জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের জন্য টানা ৪৫ বছর সংগ্রাম করেছেন। একমাত্র ক্যাস্ট্রো ছাড়া বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে এতো দীর্ঘ সময়জুড়ে আর কাউকে দেখা যায়নি। সেই আরাফাতের জীবনাবসান ২০০৪ সালের নবেম্বরে প্যারিসের একটি সামরিক হাসপাতালে।

বৈরী পরিবেশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি আর কেউ করেননি, যা করেছেন আরাফাত। তাকে একই সঙ্গে ইসরায়েল, আমেরিকা এবং নিজ দেশের কট্টরপন্থি সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে রাজনীতি করতে হয়েছে। তারপরও তিনি ফিলিস্তিনের চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। তবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার যে বীজ তিনি জনগণের হৃদয়ে বপন করে দিয়ে গেছেন তার কুঁড়ি থেকে ফুল একদিন ফুটবেই। সেই ফুল আরাফাতের কথাই বলবে।

ইউক্রেনে অচলাবস্থা : আমেরিকা রাশিয়া দ্বন্দ্ব

১৯৯০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তাদের স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলেও ইউক্রেনের নির্বাচনকে ঘিরে আবার মস্কো আর ওয়াশিংটনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাবেক এই অঙ্গরাজ্যটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২১ নবেম্বর। সেই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ইউনোকোভিচ ও বিরোধীদলীয় নেতা ভিক্টর ইউশেঙ্কো। নির্বাচনে ইউনোকোভিচ জিতলেও ইউশেঙ্কোর সমর্থকরা তা মেনে নেননি। তারা রাজধানী কিয়েভের ইন্ডিপেনডেন্ট স্কয়ারে সমবেত হন এবং এ নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান। তারা নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আনেন। বিষয়টিতে সরকার পক্ষ অনড়, বিরোধী পক্ষও নমনীয় নয়। প্রধানমন্ত্রী ইউনোকোভিচকে সমর্থন দেয় রাশিয়া আর ইউশেঙ্কো সমর্থন পান যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত জয় হয় ইউশেঙ্কোর। সুপ্রিম কোর্ট ওই নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে ২৬ ডিসেম্বর পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউনোকোভিচের সমর্থকরা মনে করে, ইউশেঙ্কো জয়ী হলে ইউক্রেন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে বিক্রি হয়ে যাবে। অন্যদিকে ইউশেঙ্কো মনে করেন, ইউনোকোভিচরাই দেশকে বিভক্ত করে দিচ্ছেন। রাশিয়া সরাসরি অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব ইউশেঙ্কোকে সমর্থন দিচ্ছে। তবে তারা এ নির্বাচনে নাক গলাবে না। এ কথা উল্লেখ করে বলেছে, যদি ইউশেঙ্কো বিজয়ী হন, তবে তার মধ্যেও তারা কাজ করতে পারবে। এতেই স্পষ্ট ইউনোকোভিচের প্রতি তাদের সমর্থন। আর এই স্নায়ুযুদ্ধের বলি কেবলই ইউক্রেনবাসী।

নতুন বছরে যুদ্ধ চাই না

২০০৫ সালে আমরা কোনো যুদ্ধ দেখতে চাই না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সুমতি হোক। কন্ডোলিৎসা রাইসের সুমতি হোক। মার্কিন জনগণ সবাই মাইকেল মুরের 'ফারেনহাইট+৯/১১' ছবিটি দেখুন, রাজনৈতিকভাবে সচেতন হোন, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও বিশ্ব আছে, তা বুঝতে শিখুন। রাশিয়া ভালো থাক। পুতিন বেকার সমস্যা সমাধানের দিকে মনোযোগ দিন, ইউক্রেন থেকে মনোযোগ সরিয়ে আনুন। সাবেক অঙ্গরাজ্য হিসেবে নয়, তাদের স্বাধীন প্রতিবেশী হিসেবে দেখুন। ফিলিস্তিনে শান্তি আসুক। আর কত কাল তাদের এভাবে ইসরায়েলের কাছে অপমানিত হতে হবে? মাহমুদ আব্বাস আহমেদ কোরেই, আপনারা আপনাদের নেতার আদর্শে অবিচল থেকে তার পথেই বাকি কাজগুলো শুরু করুন। জনগণের আস্থা অর্জন করুন আগে। কারজাই, এবার জনগণের দিকে মনোযোগ দিন।

ভারতের কংগ্রেস সরকারের সুনাম এ বছর আরো বাড়তে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের আশাতীত কোনো উন্নতি না হলেও অবনতি হবে না হয়তো। ইরাক পরিস্থিতির উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তারপরও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ইরাকে নির্বাচন হোক। নির্বাচিত দল ক্ষমতায় যাক। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক দজলা, ফোরাতের দুই তীরে। শান্তি আসুক বাংলাদেশসহ পুরো উপমহাদেশে। শান্তি আসুক বিশ্বে। শান্তি চায় বিশ্ববাসী।